ভূমিকা

রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায় হিসেবে আমরা ১৮৮১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করেছি। অর্থাৎ 'রুদ্রচন্ড' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত আমাদের বিবেচনায় রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়। এই প্রথম পর্যায়ের নাটক গুলি অপরিণত নাটক বলে অবহেলিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নাট্যাদর্শের কি কোনই আভাস মেলে না এই পর্যায়ের নাটক গুলিতে? আমরা জানি যে 'শারদোৎসব' (১৯০৮) রচনার মধ্যদিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব জগতে প্রবেশ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব রীতি। কিন্তু এই নিজস্ব রীতি তো হঠাৎ করে দেখা দেয়নি, এর পিছনে রয়েছে নিজেকে প্রস্তুত করার ক্রম প্রচেষ্টা। আমাদের চিহ্নিত রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যদর্শের পথ অনুসন্ধান করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং প্রস্তুত করেছেন নিজেকে। এই পর্বেই দেখা দিয়েছে তাঁর নিজস্ব নাট্যাদর্শের কোরক। রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান আমাদের এই অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। এই সন্ধান চালাতে গিয়ে আমরা নাটকগুলিকে Form এবং Content দু'দিক থেকেই বিশ্লেষণ করেছি। এই বিশ্লেষণে উঠে এসেছে অপরিণতির মধ্যেও পরিণতনাট্যের কিছু চিহ্ন। বিশেষ করে আমাদের মতে 'প্রকৃতির পতিশোধ' নাটকেই রবীন্দ্রনাথ গেঁথে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর নিজস্ব নাট্যাদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের নাটক শুরু থেকেই একটি বিষয়বস্তুরই প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে আর তা হচ্ছে বন্ধনমুক্তির কথা অথবা আত্ম-অহং-এর অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির কথা। এর পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নাট্যচরিত্রগুলির মানসিক উত্তরণ এবং মানবিক উত্তরণের কথা। বিষয়বস্তুর এই প্রকাশ ক্ষীণভাবে শুরু হয়েছে প্রথম নাটক 'রুদ্রচন্ড' থেকেই। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় এই পর্বের কাহিনীকাব্যগুলিতেও ছড়িয়ে আছে তার ঈষৎ আভাস। এ কারণে আমরা কাহিনী কাব্যগুলিরও আলোচনা করেছি।

রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ের বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আমরা আলোচনাকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত

করেছি। প্রথম অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের অভিব্যক্তির ধারা'। এই অধ্যায়ে 'রুদ্রচন্ড' থেকে 'বিসর্জন' পর্যন্ত নাটক গুলির আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কাহিনীকাব্য গুলির। দ্বিতীয় অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার'। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাটক গুলির কথা। কবি রবীন্দ্রনাথ ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা কি কোন ভেদরেখা টানতে পারি? আমরা কি তাঁর কাব্যিক ভাবমন্ডল থেকে তাঁর নাটক সমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভাবমন্ডলের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করতে পারি? নাকি একটি ঐক্য নিরূপন করতে পারি রবীন্দ্রকাব্য আর রবীন্দ্রনাটকের মধ্যে? কাব্যবিষয় ও নাট্যবিষয় কি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে নাকি দু'টি ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুও হয়ে গেছে দু'রকম? প্রথম পর্যায়ের নাটক ও কাব্যের তুলনামূলক আলোচনায় এসবেরই মীমাংসা আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। তৃতীয় অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ে পরিণত পর্যায়ের বীজানুসন্ধান'। এই অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি যে প্রথম পর্বের নাটক গুলিতে পরিণত পর্বের বীজ কতটুকু এবং কিভাবে রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় 'রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায় ও সমকালীন বাংলা নাটক'। রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ের সমকালে অন্যান্য যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে সেই সব নাটক থেকে রবীন্দ্রনাটক কতটুকু স্বতন্ত্র, সমকালীন নাট্যচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের কোন যোগসূত্র আছে কিনা, যদি থাকে তবে যোগসূত্র কোথায় এবং যদি না থাকে তবে কোথায় রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতা এইসবই আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নাট্যকর্মের আলোকে আমরা তাঁর প্রথম পর্যায়ের নাটক গুলির পর্যালোচনা করেছি। এই পর্যালোচনার মধ্যদিয়ে আমরা দেখাতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাট্য ধারার প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের পরিণত নাট্যের বীজ কতটুকু নিহিত রয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভ আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড: অঙ্কুশ ভট্ট-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। তাঁর প্রতিমুহূর্তের সহযোগিতা আমার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। ড: অশ্রুকুমার সিকদার অভিসন্দর্ভের পান্ডুলিপি পাঠ করে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীভূদেব চৌধুরী, রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল, শান্তিনিকেতন পাঠভবনের শিক্ষক অনাথনাথ দাস, রবীন্দ্রগবেষক রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সর্বজিৎ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক মৃণাল দাসগুপ্ত আমাকে বিভিন্ন সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের প্রতিটি কর্মীকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা সবাই আমাকে অকৃপণ ভাবে সাহায্য করেছেন। কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী, এখানে মূল্যবান কিছু গ্রন্থ দেখার সুযোগ পেয়েছি।

বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকার প্রতিলিপি সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছে বিশ্বভারতী সংগীতভবনের ছাত্রী সুস্মিতা গোলাম তন্বী। তার সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। আমার কলেজের অধ্যক্ষ মো: মোফাজ্জল হোসেনকে এবং কলেজ পরিচালনা পর্ষদের প্রতিটি সদস্যকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের প্রচেষ্টায় শিক্ষাকালীন ছুটি অনুমোদন হওয়ার কারণে আমার গবেষণার পথ সুগম হয়েছে। আমি আমার পরিবারের সকলের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার মা এবং বড়ভাই সুব্রত ভট্টাচার্যের অনুপ্রেরণা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে আমার বন্ধুবর আব্দুল কাদের সাফিলী, খয়বর আলী মিয়া, আরিফুল হক রুজু এবং রঞ্জন শর্মা। তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমাকে গবেষণা করার সুযোগ দেবার জন্য সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।